OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 837 - 843
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আদি-মধ্য যুগে নিম্ন গাঙ্গেয় উপকূলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

শুভ্রাংশু সিংহ
প্রাক্তন ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : singhasubhranshu73@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
আদিগঙ্গা, আঞ্চলিক ইতিহাস, সমাজ, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, গোত্র, সত্যনারায়ন, মধ্যযুগ, দক্ষিণবঙ্গ।

Abstract
একদা অনার্যদের বাস বলে আর্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত ছিল বাংলার বিশাল অঞ্চল। ভগীরথের ‘গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত’কে যদি আমরা দক্ষিণবঙ্গে আর্য সভ্যতার বিকাশ বলে মনে করি তাহলে বুঝতে হবে মহাভারতের পর্ব থেকে এই অঞ্চলটি আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। মৌর্য–গুপ্ত-পাল-সেন এবং মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে একদা গঙ্গার মূল ধারা অধুনা লুপ্ত আদি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির-বিভিন্ন মানুষের-বিভিন্ন বর্ণের সংস্পর্শে এসেছিল। আঞ্চলিক দেবদেবী-লোকাচার, আর্য সংস্কৃতি এবং সুফি ভাবাদর্শের সংমিশ্রণের ফলে এই অঞ্চলে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, একদিকে যেমন বাণিজ্যের উন্নতি, উন্নত সভ্যতার বিকাশ, বিদ্যোৎসাহী পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তেমনি এক মিশ্র বর্ণ ব্যবস্থা ও জাতি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যার ফলে আমরা এই অঞ্চলে এক উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও এক উদার ধর্মীয় পরিমণ্ডল দেখতে পাবো।

Discussion

মধ্যযুগের শেষের দিকে 1560 এর দশকে বাংলায় ‘বারো ভূঁইয়া’ বা 12 জন আঞ্চলিক শাসনকর্তার উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য তুর্কি আমলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যশোহর ও দক্ষিণ 24 পরগনা নিয়ে স্বাধীন যশোহর রাজ্য গড়ে তোলেন যার সীমানা পশ্চিমে ভাগীরথী (আদি গঙ্গা নামে পরিচিত) পূর্বে মধুমতি হরিণঘাটা নদী ছিল এর সীমানা। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন মদন মল্ল বা মদন রায় যিনি ছিলেন মধ্যযুগের দক্ষিণ 24 পরগনার একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। দক্ষিণ বাংলার লোকগানে তার নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে যেমন ঘুটিয়ারি শরিফের মোবারক গাজীর মাহাত্ম্য প্রচারক গানে যা ‘গাজিরগান’ নামে পরিচিত ও ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচারক রায়মঙ্গল কাব্যে তাঁর নাম উল্লিখিত আছে, মদন রায় নামে আজও মদন পালা গীত বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। এই মদন রায় আদি গঙ্গার তীরে জনপদ গড়ে তোলার জন্য সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষকে রাজপুর ও তার আশেপাশের গ্রাম সমুহে বসবাস করার বন্দোবস্ত করেন। কর্মকার, বণিক, মোদক, গন্ধবণিক, কুম্ভকার, সদগোপ, তন্তুবায় প্রভৃতি বর্ণের মতই বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ’রা এই গঙ্গাতীরে বসবাস করতে লাগলেন[১]। আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে ক্রমে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল,

কিন্তু পরবর্তীতে পর্তুগীজদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন এই এলাকা পরিত্যাগ করে, পরে মোগল শাসনকালে আবার জনসমাগম ঘটে, আকবরের আমলে টোডরমল 'মদনমল্ল' বলে একটি পরগনার সৃষ্টি করেন। ইংরেজ আমলে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার জন্য 'দক্ষিণের নবদ্বীপ' নামে খ্যাত হয়েছিল, এখানকার পন্ডিত ব্রাহ্মণরা চতুষ্পাঠী চালাতেন, লর্ড উইলিয়াম বেনটিংক এর আমলে 'মেকলে মিনিট' দ্বারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু হলে পূর্বেকার সংস্কৃতি গৌরব অস্তমিত হয়।

ঐতরেয় আরণ্যক অনুযায়ী পুণ্ড্র, অঙ্গ বঙ্গ প্রদেশের[২] বর্ণনা পাই। মনুসংহিতায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ[৩] উল্লেখ পাই। দক্ষিণ 24 পরগনার এই ভূখণ্ডটির কথা বাল্মিকী রচিত রামায়ণে[৪] পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্বে[৫] অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বঙ্গের অধিপতি সমুদ্রসেন ও তাম্রলিপ্তের রাজাকে ভিম পরাজিত করেন। এরপর পাণ্ডবেরা গঙ্গা সাগর সঙ্গমে স্নান করে কলিঙ্গের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণু, গড়ুর, মৎস্য পুরানে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণ অনুযায়ী অন্ধ আর্য ঋষি দীর্ঘতম ঔরসে বলিরাজার পত্নীর গর্ভে পাঁচটি ক্ষত্রিয় সন্তানের জন্ম হয় এরা হলেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ ও পুণ্ড্র। এই অঙ্গ হল বর্তমান ভাগলপুর, বিহার অঞ্চল, উড়িষ্যা কটক নিয়ে কলিঙ্গ, বঙ্গ বা বাংলা হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পদ্মা-মেঘনার অববাহিকা, সুক্ষ হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম জেলা (যা পূর্বে রাঢ়), পুণ্ড্র হল উত্তর বঙ্গের বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি জেলা। পুরান পরবর্তীকালে পুণ্ড, পুন্ড্রবর্ধন ভক্তি রূপে সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডকে বোঝানো হয়। 'রঘুবংশম্' এবং 'বৃহৎসংহিতা'তে আমরা বাংলাদেশের বর্ণনা পাই।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রতটি মন্ডলের পরিদর্শনে আসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ (638 খ্রিস্টাব্দ)। হিউ এন সাং এর বর্ণনায় আমরা বাংলার নানা স্থান এর মত সমতটের বর্ণনাতে পাই যেখানে তিনি সমতটের মানুষজনদের প্রশংসা করেছেন কষ্টসহিষ্ণু খর্বাকার কৃষ্ণবর্ণের বিদ্যার অনুরাগী বলে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় গঙ্গারিডি উল্লেখ পাই, এই গঙ্গারিডি গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম দিকের বদ্বীপ অংশ বলে মনে করা হয়। মেগাস্থিনিস ও রোমান কবি ভার্জিলের 'Georgics' কাব্যে গঙ্গারিডি রাজ্য ও জাতির উল্লেখ আছে। এদের বর্ণনানুসারে গঙ্গারিডি ও প্রাসি/ প্রাচি দুটি পরাক্রান্ত শক্তিশালী রাজ্য ছিল, এদের অধিপতি ছিলেন নন্দ বংশের রাজা। হস্তী বাহিনীর ভয়ে গঙ্গারিডি আক্রমণ করতে সাহস করেননি আলেকজান্ডার। প্লিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রাম এর কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান সাগরদ্বীপে সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রম। তাঁর আবির্ভাব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক আগে। 'শ্রীমৎ ভাগবত' অনুযায়ী কপিল তার মায়ের আদেশ সাগর সঙ্গমে আসেন। বায়ুপুরাণ ও কূর্ম পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলকে 'রসাতল' বলা হয়েছে, যেখানে অসুর মহানাগ ও রাক্ষস দের বাসস্থান ছিল, এই অঞ্চলে আর্যরা বাস করতনা, আর্যরা আর্যবর্ত (হিমালয় - বিন্দ মধ্যবর্তী) অঞ্চলে বাস করত। বঙ্গভূমি অনার্যদের অধিকারে ছিল, অস্ট্রিক দ্রাবিড় প্রভৃতি জন জাতির বাসস্থান। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ এইসব অঞ্চলে কৌম বা ট্রাইব গোষ্ঠী বাস করত তাদের নামে এইসব অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এইসব অঞ্চলের উল্লেখ আছে, 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়ের নাম উল্লিখিত। কপিলমুনি এই অঞ্চলে আসার পর এই অঞ্চলটি আর্য বসতি হয়ে ওঠে ভগিরথ এর গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত আর্য জনপথ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের সুষেন সাগরদ্বীপে রাজত্ব করতেন।

উক্ত অঞ্চলগুলি মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের পর গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তগত হয়। মাৎস্যন্যায় এর পূর্ববর্তী যুগে প্রায় 400 বছর ধরে বাংলার ক্ষমতায় ছিলেন পাল রাজারা, ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মালম্বী কায়স্ত পাল রাজারা সাম্রাজ্য পরিচালনাতে পরমতধর্মসহিষ্ণু ছিলেন, এনারা যোগ্যতা অনুযায়ী বর্ণ ভেদে নিয়োগ করতেন। বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দির পালদের সাহায্য পেতে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি ব্যাঘ্রতটি মন্ডলের উল্লেখ পাই, যা পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরবর্তীকালে সেন রাজাদের আমলে খাড়িমণ্ডল পুন্ড্রবর্ধন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই মণ্ডল দুটি দক্ষিণ 24 পরগনার অন্তর্ভুক্ত[৬] হয়। গুপ্ত যুগে এই অঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত হয়ে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তী হয়েছে যার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র বরেন্দ্রী, ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পর্যন্ত মেঘনা পর্যন্ত অঞ্চল সমতট। বাংলায় ব্রম্ভ-ক্ষত্রিয় সেন রাজবংশের বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার কারনে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষরা

অত্যাচারিত হয়ে বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণকে স্বাগত জানিয়েছিল যা - রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণ এ প্রমাণ মেলে, এই নিম্নবর্ণের মানুষরা প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তীকালে মুসলমানদের সময় মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বোঝা যায় গঙ্গার মূল ধারা হাওড়ার বেতড়ের কাছে উৎপত্তি হয়ে আলিপুর, কালীঘাট হয়ে গড়িয়া, রাজপুর, কোদালিয়া, মালঞ্চ, হরিনাভি ইত্যাদি অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোবিন্দ পুর, বারাইপুর, সূর্যপুর হয়ে জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে সুন্দর বনের গভীরে প্রবেশ করেছে, তারপর কাকদ্বীপ, সাগরের মনসাদ্বীপ হয়ে কপিল মুনির মন্দিরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, বর্তমানে আদিগঙ্গা মজে[৭] যাবার জন্য ছোট ছোট পুকুরে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে পুকুরগুলো যাদের দখলে গেছে সেই অনুযায়ী নাম হয়েছে যেমন ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, করের গঙ্গা। এইসব গঙ্গা পুকুরে আজ লোকে পুণ্য লাভের আশায় স্নান করে, এইসব পুকুরের ঘাটে আজও শব দাহ করার ঘাট আছে। এই সকল পুকুর যে আদি গঙ্গা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্ন বর্ণিত প্রমাণে -

বৃন্দাবন দাসের 'শ্রী চৈতন্যভাগবত' কাব্যে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য নীলাচল যাত্রার যে বর্ণনা আছে তার সাথে আদিগঙ্গা পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলি আজও দেখা যায়, এছাড়াও পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই এর 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখতে পাই চাঁদ সওদাগর কালীঘাটে পুজো দিয়ে ডিঙা ভাসিয়েছিলেন বাণিজ্যের জন্য। ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' পুঁথিতে ধনপতি সওদাগরের আদিগঙ্গা ব্যবসা করতে যাবার উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকে কবি কৃষ্ণরাম এর 'রায়মঙ্গল' কাব্যতে বণিক পুষ্পদত্তর আদিগঙ্গা হয়ে বাণিজ্য করে ফেরার বর্ণনা আমরা পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি অযোধ্যারাম পাঠকের 'সত্যনারায়ণের কথা'তে আছে জনৈক সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে যাত্রার কথা। অষ্টাদশ শতকে হরি দেবের 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে আদিগঙ্গা পথে সাগর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বণিকদের বর্ণনা পাওয়া যায়। এইসব মঙ্গলকাব্যে[৮] যেই সব স্থানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি আজও বর্তমান যেমন বৈষ্ণবঘাটা, কালীঘাট, মাহিনগর, বারাইপুর, ছত্রভোগ, মগরাহাট, জয়নগর ইত্যাদি। 1550 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক Jao De Barros এর আঁকা নকশা, তাতে তিনি হাওড়ার বেতরের ঠিক বিপরীত থেকে দক্ষিণ পূর্ব মুখী হয়ে কালীঘাটের পাশদিয়ে আদি গঙ্গা ধারা বয়ে গেছে বলে চিহ্নিত করেছেন। 1660 সালে Van De Broucke এর আঁকা ম্যাপে আদিগঙ্গা চিহ্নিত আছে। 1772 সালে Rennell বঙ্গদেশ জরিপ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেন আদিগঙ্গা মজে এসেছে, এখানে সেই সময়কার এমন অবস্থা ছিল ছোট নৌকা সারাবছর চলাচল করতে পারত না। আদিগঙ্গা মজে যাওয়ার কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক কারণ যেমন ছিল, তার সাথে যোগ হয়েছিল নবাব আলীবর্দী খাঁর ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে খাল কেটে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। ফলস্বরূপ গঙ্গার মূল স্রোত সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ন নদীর ধারা সাথে মিশে যায় যা হুগলি নদী নামে পরিচিতি লাভ করে কালক্রমে পূর্ব ধারাটি মজে যেতে থাকে। 1777 সালে মেজর টলি ফোর্ট উইলিয়াম এর দক্ষিণ থেকে কালীঘাট পর্যন্ত গঙ্গার সংস্কার করেন। রাঢ়বঙ্গ 'গঙ্গা ভগিরথ' এর স্মৃতি নিয়ে গঙ্গার বর্তমান প্রবাহ মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলি পর্যন্ত 'ভাগীরথী' নামে পরিচিত। ভাগীরথীর তীরে পর্তুগিজরা হুগলি বন্দর গড়ে তোলে হুগলি থেকে মোহনা পর্যন্ত এই বন্দরের নামানুসারে 'ভাগীরথী হুগলিনদী' হয়েছে, বিস্মিত হতে হয় এইখানে- স্বরস্বতীর কাটাখাল আর হুগলি নদীতে স্নান করলে গঙ্গাসাগরের গঙ্গাস্নানের সেই পূর্ণ অর্জন করা যায় না অথচ বাগবাজার অথবা মধ্য ও উত্তর কলকাতার যে কোন ঘাটে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পূর্ণ লাভ হয়, আবার কালিঘাট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে চলা যেকোনো খালে স্নান করলে পূর্ণ লাভ হয়।

সুন্দরবন দক্ষিণ 24 পরগনার অন্তর্ভুক্ত যার সীমানা পূর্বদিকে ইচ্ছামত, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদী, পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এর আয়তন আনুমানিক 3078 বর্গমাইল। সুন্দরবনের মণি নদীর নিকটবর্তী জটার দেউল থেকে জনৈক জয়ন্ত চন্দ্রের লেখ, মুদ্রা আবিষ্কার হয়েছে, এছাড়াও সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে মৌর্য ও পরবর্তী যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে মাটির তলা থেকে গুপ্ত, পাল, সেন যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৯] এরিয়ান এবং টলেমি লেখাতে আমরা গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনা পাই। কালীঘাটের মুদ্রা ভান্ডার যা[১০] এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমান দেয়, সাগরদ্বীপের প্রসাদপুর ও মন্দিরতলা, জটার দেউল, ছএভোগসহ অন্যান্য জায়গা থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এক সমৃদ্ধ জনপদের এক জীবন্ত প্রমান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাওড়ার ভেতর বন্দরের বিপরীত থেকে আদিগঙ্গা দক্ষিণ মুখী হয়েছে, কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে হিন্দুদের পরম তীর্থক্ষেত্র কালীঘাটের কালী মন্দির গড়ে উঠেছে যা 51 শক্তিপীঠ অন্যতম। রামায়ণ, মহাভারতে এবং রঘুনন্দনের তীর্থতত্ত্বতে কালীঘাটের নাম উল্লিখিত নেই কিন্তু ভবিষ্য পুরাণ, বিপ্রদাস পিপিলাই এর 'মনসা মঙ্গল' এ আমরা কালীঘাটের উল্লেখ পাই ।আদি গঙ্গার তীরে দেবী কালির অবস্থান, প্রথম দিকে মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন কাপালিক ও তান্ত্রিক পরবর্তীকালে শান্ডিল্য গোত্রের ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী তিনি এই মন্দিরের সেবায়েত রূপে নিযুক্ত হন। আকবরের আমলে মানসিংহ কালীঘাট মন্দির সংস্কার করার জন্য পনেরশো মোহর দান করেন, অষ্টম শতাব্দীতে সন্তোষ রায় বর্তমান কালী মন্দির নির্মাণ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দিরের নিজের জন্য।

কালীঘাট পার হয়ে আদি গঙ্গা ধারা টালিগঞ্জ বৈষ্ণবঘাটা গড়িয়া হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে কুদঘাটের কাছে বাঁক নেয় সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের বসন্ত রায় শাক্ত কালী মন্দির নির্মাণ করেন, যা করুণাময়ী কালী মন্দির নামে পরিচিত।

আদিগঙ্গা দক্ষিণমুখী যাত্রায় বোড়াল গ্রামের কাছে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী মন্দির গড়ে উঠেছে মন্দির বিগ্রহটিতে নীচে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও রুদ্রমূর্তি খোদিত আছে এদের উপরে মহাদেব শুয়ে আছে তার উপর দেবী মূর্তির অবস্থান। মূর্তির তিনটি চোখ চারটি হাত চারটি হাতেই অস্ত্র। এই মন্দির ঘিরেই এক সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল বণিকরা বাণিজ্যের আগে এখানে পুজো দিয়ে যেতেন। প্রবাদ আছে সেন বংশের রাজা সুযোগ্য সেন তুর্কিদের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য আদি গঙ্গার তীরে আত্মগোপন করে থাকাকালে তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দশমহাবিদ্যার তৃতীয় মহাবিদ্যা এই মন্দিরে অনেক সাধক সাধনা করেছেন। মূর্তি দেখে মূর্তিটি দেখে মনে হয় মূর্তিটি নদী উপাসনার দেবী গঙ্গার কিংবা কোন অনার্য লৌকিক দেবী হতে পারে। পুরানে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে দশমহাবিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ত্রিপুরা ও ছত্রভোগে অবস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী কাঠের, তিনি তান্ত্রিক মতে পূজা গ্রহণ করেন। ত্রিপুরারাজের পাঠাগারে আবিষ্কৃত 'রাজ-রত্নাকর' পুঁথিতে উল্লেখ আছে রাজা যযাতির পুত্র দুহ্য আদিগঙ্গা সাগরদ্বীপে বাস করেন তিনি কপিলমুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্য বিস্তার করেন তার উত্তর পুরুষ প্রতদন ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী কিরাত রাজ্য জয় করেন ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ রায়ের বারা বা মুন্ডু পূজার মিল পাওয়া যায় যা থেকে মনে করা হয় ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী উপাসক ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

গড়িয়ার কাছে আদি গঙ্গার ধারে মহামায়াতলার মহামায়া মন্দির এর প্রতিমা দুই হাত বিশিষ্ট যা দেখে মনে হয় কালী পরবর্তীকালে মহামায়া (দুর্গার) রূপ গ্রহণ করেছে।

ধর্ম ঠাকুরের পুজোর নিদর্শন নিম্ন বঙ্গে প্রচলিত ছিল[11] তার আজও বিদ্যমান। কলকাতার কাছে মজে যাওয়া আদি গঙ্গার তীরে রাজপুর বাজারে এখনো ধর্ম ঠাকুরের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাবা ঠাকুর, দক্ষিণরায় ঠাকুর, ধর্ম ঠাকুর প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবতা বৌদ্ধ ধর্মের সাথে মিশে হিন্দু সমাজ ও ধর্মতে প্রবেশ করেছে।

মালঞ্চের কৃষ্ণ কালী মন্দিরে মূর্তিটি চার হাতের তিন হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং চতুর্থ হাত আশীর্বাদ এর জন্য প্রসারিত করা আছে। মূর্তি দেখে মনে হয় কৃষ্ণ ও কালীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। মূর্তিটির মুখমণ্ডলে কৃষ্ণের ভঙ্গিমা এবং শরীরে কালির অবয়ব লক্ষ্য করা যায় এমন মূর্তি দক্ষিণ 24 পরগনায় দেখা যায় না। মূর্তি দেখে মনে করা হয় এটি বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মের মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে। দেবীর নৈবেদ্য হিসাবে নিরামিষ নৈবেদ্য দেয়া হয়। রাজপুর সপ্তম শতকে আনন্দময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মদন রায়, প্রভাবশালী ব্যক্তির এই মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে ব্যক্ত হয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের লোকেরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং উচ্চবর্ণীয়রা শাক্তধর্মের উপাসক ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদি গঙ্গা দিয়ে নীলাচল যাত্রাকালে আদি গঙ্গার তীরে অনন্ত রামের কুটিরে রাত্রি বাস করেন জায়গাটি মহাপ্রভুতলা নামে পরিচিত যেটি সুপ্রাচীন আটিসারা নগরীর অন্তরগত। এই জায়গায় শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার এবং প্রসার গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল নিম্নবর্ণের মানুষরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে এবং শাক্তধর্মের হিংসা মনোভাব এই বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সোনারপুর এর নিকট বোসপুকুরে বাবা ঠাকুরের মন্দির এবং মন্দিরের পাশে পীরের আস্তানা লক্ষ করা যায়। লক্ষনীয় বিষয়টি হোল, অতীতে নিম্নবর্ণের পূজারী দ্বারা তিনি পূজা গ্রহণ করতেন ক্রমে এতে আর্য ধর্মের প্রবেশ দেখা যায়

- ব্রাম্ভন পূজক, শিবের মন্ত্র, নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা বর্ণহিন্দুরা ইনার পূজা করেন। স্থূলকায় চেহারার গোঁফ যুক্ত মূর্তির রক্তবর্ণের মুখমন্ডল, জটা, কানে ধুতরা ফুল আর তিনটি বড় বড় রক্তবর্ণ চোখ দেখা যায়। মূর্তিটির পরনে শুধু মাত্র বাঘের চামড়া কিন্তু গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও উপবীত। বাবা ঠাকুর একজন লৌকিক দেবতা কিন্তু কোনোভাবেই আঞ্চলিক নন কারণ দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়াও হাওড়া হুগলি বর্ধমান নদীয়াতে বাবা ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে। বাবা ঠাকুর একজন আদিম অনার্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দেবতা। দ্রাবিড়দের 'তিরুবয়র' নামে দেবতার সঙ্গে পঞ্চানন্দ ও বাবা ঠাকুরের সাদৃশ্য দেখা যায় এবং গুজরাটের ভিল গোষ্ঠীর লৌকিক দেবতাদের নাম 'বাবাদেও'। বাবা ঠাকুরের বিগ্রহ দেখে শিবের বিগ্রহের মিল পাওয়া যায় যা দেখে মনে করা হয় অনার্য দেবতা ক্রমে আর্যদের দেবতা হয়ে ওঠেন।

আদি গঙ্গার পাশে বাগুইপাড়ায় (বর্তমান রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অন্তর্গত) এখানে হারিঝী চণ্ডীর মন্দির। এনার সৃষ্টি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকের মতে বৌদ্ধ ধর্মের দেবী, কারুর মতে নাথ ধর্মের, মূর্তিটি কালো পাথরের মুন্ড মূর্তিতে দেবীর পূজা হয় দেবীর তিনটি গোলাকৃতি চোখ, কপাল থেকে ঠোঁট পর্যন্ত নেমে আসে নাক, মুখে এক কঠিন ভাব প্রকাশ পেয়েছে, এক ফুট লম্বা প্রায় ৪ ইঞ্চি চওড়া মূর্তিটিতে কোন শিল্পকর্মের ছাব নেই। বোঝা যায় মূর্তিটি আর্য পূর্ববর্তী যুগের পাথর পূজার সময়কার, কোন আদিম জনগোষ্ঠীর। এই অঞ্চলে হাড়ি জাতির উপস্থিত দেখে মনে করা হয় মালাধারি বা শব্দের দ্বারা তিনি একসময় পূজিত হতেন। বর্তমানে অন্যান্য অনেক অনার্য দেব দেবীর মত হারিঝীচণ্ডীর মধ্যে আর্য ধর্মের প্রভাব দেখা গেলেও এখনো পুজা মন্ত্রা চন্ডী বা কালীর ধ্যান মন্ত্র ব্যবহার করা হয় না।

আদিগঙ্গা তীরে অনেক জায়গায় বিশালক্ষী দেবীর মন্দির গড়ে উঠেছে। বিশালক্ষী নামটি বাসলি নামের তান্ত্রিক দেবীর আর্য প্রভাবের ফলে বিশালক্ষী নামে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বেদে বাসলি নাম উল্লেখ নেই মনে করা হয় ইনি দুর্গা চণ্ডীর এক লৌকিক রূপ যিনি মাংস মদ সহকারে তান্ত্রিক মতে পূজিত হন। এই বিশালাক্ষী এরমধ্যে অস্ট্রিক আর্য ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। মহাযান শাখার সহযানী বৌদ্ধরা বাসুলি দেবীর উপাসনা করতেন, এর উল্লেখ আমরা চর্যাপদের পাই। সেন রাজাদের সময় সহযানি তান্ত্রিক মতের প্রভাব কমে, সহযিয়া তান্ত্রিকরা তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সহযিয়া বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন। মদ্যমাংসভোজী দেবী 'বাসলী' উচ্চবর্ণের সমাজ থেকে বর্জিত হয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণ শবর, ধীবর প্রভৃতি সমাজের পূজিতা ছিলেন। পরে দেবীর জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠায় উচ্চবর্ণের মানুষেরাও আকৃষ্ট হয়ে পূজা শুরু করেন। নিম্নবর্ণের পুরোহিতেরা বিদায় নেন। সংস্কৃত মন্ত্রে দেবীর উপাসনা আরম্ভ করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। 'বাসলী' নামটি সম্ভবত তখনই 'বিশালাক্ষী'তে রূপান্তরিত হয়। দক্ষিণ ভারতের 'বিসলমারী' দেবী ও বাংলার 'বাসলী' বা 'বিশালাক্ষী'। বাংলার ধর্ম–সংস্কৃতিতে যে দ্রাবিড় সংস্কৃতির উপাদান আছে তা অস্বীকার করা যায় না। উড়িষ্যাতে বাসলী দেবীর প্রভাব ছিল। জগন্নাথ মন্দিরের এক কোণেও বাসলীর মন্দির আছে। মধ্যযুগে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে বাসলী দেবীর প্রভাব ছিল তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে বাসলী পূজার উল্লেখ।

আদিগঙ্গা মোহনায় সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির মন্দির গড়ে উঠেছে। মহাভারত, কালিদাসের রঘুবংশ, উপনিষদে আমরা সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির মন্দির এর কথা জানতে পারি। গুপ্ত পরবর্তী যুগ থেকে মন্দিরটি হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

সেনদের পতনের সাথে সাথে মুসলমান শাসকদের শাসনকালে পীর গাজীদের আগমন ঘটে এই অঞ্চলে। দক্ষিণ 24 পরগনততেও এদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় – এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন বড় খাঁ গাজী যার সাথে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ হয়েছিল এছাড়াও ঘুটিয়ারি শরিফের মোবারক গাজী, টালিগঞ্জের মুকসদ গাজী, এলাচির রক্তান গাজী, সোনারপুরের খোঁড়া গাজী, নরেন্দ্রপুর এর কাছে কামালগাজি উল্লেখযোগ্য।

পাল যুগের শেষ থেকে এবং সেন যুগের প্রথম থেকে নারায়ন পূজা প্রচলন হয় বাংলায়। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌন্ড্রক্ষত্রিয়রা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তীকালে শাক্তধর্ম গ্রহণ করে এবং আরো পরে ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে, এরা ক্ষত্রিয় দের মত উপবীত ধারণ করে। এই অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা উপবীত গ্রহণ করে। আদিগঙ্গা গঙ্গার তীরবর্তী দেবতাদের পাশেই পীর গাজী আস্তানা গড়ে উঠেছে। মুসলমানদের ধর্মান্তকরণের সময় এই সুফি

গাজিরা নিম্নবর্ণের মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। হিন্দু সমাজের এই ভাঙ্গন রোধ অনেকাংশেই শ্রীচৈতন্যদেব রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে কবি কৃষ্ণরাম এর রায়মঙ্গল গ্রন্থে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর, দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণের সঙ্গে বনবিবির বিরোধ ঘটে এই বিরোধ মীমাংসা করেন স্বয়ং ঈশ্বর যার হাতে ছিল পুরান আর অন্য হাতে ছিল কোরান, এই বিরোধের পর ঠিক হয় ভাটি অঞ্চল দক্ষিণ রায়ের অধিকার গণ্য হবে এবং গাজী সাহেবের স্বীকৃতি বহাল থাকবে। এই কাহিনী থেকে মনে করা হয় গাজী ও পীরের আগ্রাসন থেকে দক্ষিণরায়, যিনি মদন রায় বা মদন মল্ল নামে পরিচিত ছিলেন তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ভাই কুমার রায় তাকে সাহায্য করেন। দক্ষিণরায় বাঘের দেবতারূপে পূজিত হন এবং কালু রায় কুমির দেবতারূপে এই অঞ্চলে পূজিত হন। বাঘ ও কুমির সম্ভবত স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতীক ছিল। দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর নামে রাজপুর অঞ্চলে দুটো মন্দির এখনো বর্তমান।

দক্ষিণ 24 পরগনার ধর্ম স্থান গুলির মধ্যে এক বিচিত্র ধর্ম সমন্বয় গড়ে উঠেছে। হিন্দু শাস্ত্রীয়,[১২] পৌরাণিক দেবদেবী থেকে এখানে লৌকিক দেব দেবীদের পূজার প্রচলন অনেকাংশে বেশি। বাবাঠাকুর, পাঁচুঠাকুর, পঞ্চাননঠাকুরের সাথে সাথে বিশালাক্ষী, মঙ্গলচন্ডী, মনসা-সহ নানান লৌকিক দেব দেবী উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ মহাযান ও সহজযান, হিন্দু দেবদেবীর, পীর-গাজী[১৩] সাহেব আর বন বিবি উপস্থিতি বা আস্তানা একই সাথে গড়ে উঠেছে। এই সকল দেব দেবীর কাছে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই ভক্তি নিবেদন করে। হিন্দুর নারায়ন আর মুসলমানদের পীর মিলিত রূপ সত্যনারায়ন এর সৃষ্টি করে। লক্ষণ সেনের পরাজয়ের পর এ অঞ্চল হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় প্রভাব এ এক নতুন ভাবনায় পুষ্ট হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলে পীর সাহেবদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, ‘পাঁচপীর’ এর নাম নিয়ে মাঝিরা সমুদ্রযাত্রা করতেন। এ অঞ্চলে আরেক লোকদেবতা হল বনবিবি যিনি অস্ট্রিক চিন্তাধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলেন, তিনি বৃক্ষ ও বনের দেবতা রূপে পূজিত হতেন। হিন্দুদের কাছে তিনি কোথাও বনদুর্গা কোথাও বা বনলক্ষী আর মুসলমানদের কাছে তিনি বনবিবি বন্য পশু বনের রক্ষক। এই বনবিবির অনেক নাম কোথাওবা তিনি ওলা বিবি কোথাও বা তিনি হোলা বিবি নামে পরিচিত, এদের সাত বোন সবাই দেবীরূপে পূজা পান। সুমাত্রা, যব দ্বীপ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তার করলে দেখতে পাই সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি দক্ষিণবঙ্গের লোকেরাও ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমনের ফলে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু লৌকিক দেব দেবীরা মুসলিমদের মুসলিমদের অর্জন করে এবং এ অঞ্চলের মানুষের উভয় ধর্মকেই প্রাধান্য দেয়। আর্য ভাষা সংস্কৃতি ধর্মাচারের মাধ্যমে সুপ্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলির সংযোজন ও বিভাজন ঘটেছে। বৈদিক ধর্ম দর্শন এর পাশাপাশি এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন[১৪] ধর্ম, তান্ত্রিক আচার আচরণ বিকাশ লাভ করেছে। এ অঞ্চলের জনজীবন ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম আঞ্চলিক দেব দেবীর মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার দ্বারা টিকে থাকার চেষ্টা করেছে আবার কখনো শক্তির উপাসনায় মেতে উঠেছে, কখনোবা এই শক্তি উপাসনার প্রাবল্য স্তিমিত হয়ে গেছে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে। মোগল আমলের এই অঞ্চলে পীর গাজী দের প্রভাব বিস্তার ও ধর্মান্তকরণ ঘটছে সেই সময় শশি-কালী মন্দিরের পাশে বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দের থান আর পীরের আস্তানা একসাথে গড়ে উঠেছে।[১৫]

Reference:

১. হালদার, বিমলেন্দু, দক্ষিণ 24 পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ, দীপালী বুক হাউস, 15 আগস্ট 1999, পৃ. ১৫

২. “ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা মগধাশ্চের পাদান্যান্যা অকর্মভিতো বিবিস্র ইতি’। ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।”

৩. “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষ, সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।”

৪. “দ্রাবিড়াঃ সিন্ধ সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ তন্ত্র জাতং বহুদ্রবাং ধনধান্যমজাবিকম্। ততো ঘৃণীধি কৈকেয়ি! যদযত্বং মনসেচ্ছসি॥” রামায়ণ, অযোধ্যা কান্ড, ১০ স, ৩৭:৩৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 93
Website: https://tirj.org.in, Page No. 837 - 843
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. “ততঃ পন্ড্রাধিপং বীরং বাস, দেবং মহাবলম্। কৌশিকীকচ্ছনিলরং রাজানঞ্চ মহৌজসম| উভৌ বলভাতৌ বীরাবভৌ তীব্রপরাক্রমৌ। নিজ্জি ত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজম পাদ্রবৎ॥ সমদ্রসেনং নিজ্জিত চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্। তাম্রলিপ্ত রাজানং কর্ধটাধিপতিং তথা॥” মহাভারত, সভা পর্ব, ৩০'২২-২৪

“স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নপা। নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম, ততঃ সমদ্রতীরেণ জগাম বসধাধিপঃ। ভ্রাতভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান, প্রতি ভারত॥” মহাভারত, বন পর্ব, ১২৪ অ।

“অঙ্গো বঙ্গঃ কলিগশ্চ পণ্ড্রঃ সংক্ষশ্চ তে সতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভাবি|” মহাভারত, আদি পর্ব, ১০৩ অ।

৬. BANGALIR Itihas AADI PARBA by NIHARRANJAN Roy, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. 67

৭. রায়, নিহাররঞ্জন, বাঙালী ইতিহাসের আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. 76

৮. History of ancient Bengal, R. C. Majumdar, G. Bhardwaj & Co, june, 1971, p. 488

৯. চট্টোপাধ্যায়, সাগর, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার অধিকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 2005

১০. Majumdar, Susmita Basu, Kalighat Hoard – The first Gupta Hoard from India, Library of Nimismatic Studies, 1 January 2014

১১. ibid, পৃ. 486

১২. Ibid, পৃ. 478

১৩. সুন্দরবনের সংস্কৃতি ও প্রত্ন ভাবনা, নব চলন্তিকা, 10 মে 2010, পৃ. 39

১৪. DWIPOBHUMI SUNDARBAN, Edited by Barendu Mandal, পৃ. 95

১৫. সুন্দরবনের সংস্কৃতি ও প্রত্ন ভাবনা, নব চলন্তিকা, 10 মে 2010, পৃ. 84